OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 117
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 113 - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নকশাল আন্দোলন ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প

ড. যাদবেশ আচার্য
গুসকরা মহাবিদ্যালয়, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান
Email ID: yadabesh@gushkaramahavidyalaya.ac.in
0009-0000-5734-0135

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Charu Banerjee, Mao Tse-tung, Naxal movement, The seventies, life experience, young people, genocide, bloodthirstiness, fire, death.

Abstract

Under the leadership of Charu Banerjee, the revolutionary activities of the Naxalite movement began and spread throughout Bengal. Not only did it bring about historical changes throughout Bengal, it also left scars in society, the impact which cannot be denied even today.

The influence of society inevitably comes into literature. These socio-political and character issues have repeatedly emerged in the hands of Bengali storytellers. Samaresh Basu, Asim Roy, Mahasweta Devi, and Amiyabhushan Majumdar have all written stories with the Naxalite movement as a backdrop. While discussing Amiyabhushan's stories, one can also find his thoughts and ideas about the Naxalite movement and the agitators. Some of Amiyabhushan's famous stories about Naxalism are Pairar Khop', 'Tantra Siddhi', 'Mrinmayee Opera' etc. In the fragmentary images that Amiyabhushan has presented in th e story, we find not only the fiery bloodshed of Bengali society, but also several images of oppression.

In the story 'Pairar Khop', we find the story of a family completely falling apart. Amiyabhushan has very clearly depicted that people from both sides of the Naxalite movement are part of this family and both sides are equally affected. Again, in the story of 'Tantrasiddhi', the need for bloodlust in humans is a primal instinct, and its result may be the Naxal movement. That is why the objective of both the pro and anti-protesters was to hand people over to death. It is as if people have become bloodthirsty, and their lust will be satisfied with the blood of others. In this way, Amiyabhushan viewed the Naxalite movement from different perspectives and embodied them in his stories and novels.

Discussion

১৯৬৯ সাল, কলকাতা শহীদ মিনারের তলায় এক জনসমাবেশে সি. পি. আই. (এম. এল.) দলের জন্ম হয়, যা জনসাধারণের কাছে নকশালবাদী বলে পরিচিত হয়। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে এদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লবের নায়কেরা সাতের দশককে বাংলার মুক্তির দশকে পরিণত করার অগ্নিগর্ভ ঘোষণা করে। চীনের বিপ্লবের অনুসরণেই এই বিপ্লব এবং চীনের চেয়ারম্যান মাও-কেই এরাও নিজেদের চেয়ারম্যান রূপেই ঘোষণা করে। লিনপিয়াও-এর গেরিলাযুদ্ধের কৌশলকে এরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 117
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করে। হাজার হাজার কিশোর তরুণ-তরুণীরা 'রেডবুকে' দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবে আত্মোৎসর্গ করে। তারা অস্ত্র সংগ্রহ করে পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ হত্যার মাধ্যমে। তাদের মূলত পরিকল্পনা ছিল শাসনযন্ত্র তথা শাসন ব্যবস্থা এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে আঘাত হানা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তারা রক্তলীলা শুরু করে। এই সময় বিভিন্ন রাজ্যে এবং এই রাজ্যেরই বিভিন্ন প্রান্তে মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারীর ফলে যে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ নেয় নকশালদের হাতে পড়ে। সাধারণ যুবক-যুবতীরা প্রাণ দিতে লাগলো নির্দ্বিধায়। যে সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না, তাদের উপেক্ষা করে, ঘৃণা করে – সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তাদের প্রতিবাদ, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আক্রমণ করে তারা। অন্যদিকে সরকারের তথা রাষ্ট্রের তরফ থেকে এই বিপ্লবকে স্তব্ধ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার কার্যক্রম শুরু হয়।

মানবহিংস্রতার এই রক্তলীলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি। অস্থির সময় ধারালো অস্ত্রের ডগায় মানবতাবাদ ও মূল্যবোধকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। উঁচুতলার মানুষ যেমন মৃত্যু ভয়ে কাঁপছিল, তেমনি নীচুতলার সাধারণ ঘরের সন্তানেরা বাড়ির বাইরে আর ফিরছিল না। তাই প্রধান উপার্জিত ব্যক্তিহারা পরিবার এবং সন্তানহারা পরিবারের অবস্থা প্রায় একই রকম। ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল বাংলার সমাজ ব্যবস্থা। সঙ্কটকালের যে সূচনা হয়েছিল তার সূত্রপাত সেই চল্লিশের দশকেই; বলা যায় ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে সর্বস্ব হারানোর বেদনা ঘিরে ধরলো। ১৯৪১ এর জাপানী আক্রমণ থেকে শুরু করে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গন কলকাতা তথা সমগ্র বাংলা, দাঙ্গা, আজাদ হিন্দ আন্দোলন, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু আগমন – অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কালোবাজারি, রেশনের অব্যবস্থা, মিলিটারি সাপ্লাই, সমাজজীবনের অধোগতি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় – যেন একটা বিধ্বংসী স্রোত চলছিল সমগ্র বাংলার বুকে। এই বিপর্যস্ত বিদ্ধস্ত অশান্ত বিক্ষুব্ধ পটে বাংলা ছোটগল্প নিজরূপে আবির্ভূত হল। এই অশান্ত সময়ের সাক্ষী রূপেই ছোটগল্পকারেরা গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। আর নকশালবাদী আন্দোলনের অগ্নগর্ভ অবস্থাকে বাংলার সাহিত্যিক সম্প্রদায় তাঁদের চিন্তন ও মননে খুব গভীর থেকে অনুভব করেছিলেন, কেউ কেউ আবার এই আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিলেন, যারই প্রতিফলন তাঁদের সাহিত্যে উৎকৃষ্ট রূপে শিল্পরূপ পেয়েছে। এই আন্দোলন ছোটগল্পের জগতেও নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেছে – সেখানে যেমন দেখাগিয়েছে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে গল্প লেখা, তেমনি দেখি আন্দোলনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে গল্প। আবার দেখি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজ-পরিবার-মানুষের দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি, অন্যদিকে মানবমনের জটিল ও নির্মম পরিণতি লক্ষ করি এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই। সার্বিকভাবে নকশালবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মূল্যবান বেশ কিছু গল্প আমরা পেয়ে যায়— সমরেশ বসুর 'সিদ্ধান্ত'; অসীম রায়ের 'শ্রেণীশত্রু', 'অনি'; মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু?', 'দ্রৌপদী', 'জল', 'এম ডব্লু বনাম লখিন্দ'; নবারুণ ভট্টাচার্যের 'খোঁচড়' ইত্যাদি। এছাড়াও অমিয়ভূষণ মজুমদারের বেশ কয়েকটি গল্প।

নকশালবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন চিত্র ও তার প্রভাব বিচ্ছিন্নভাবে অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্প-উপন্যাসে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর চিন্তাধারা ও মানসিকতার প্রকাশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধে। অমিয়ভূষণ নিজে মনে করেন সাহিত্যিকের জীবনবোধ বাইরে থেকে অর্পিত তাঁর কোনো চিন্তা-ভাবনা বা দর্শনের বিষয় নয়, তা তৈরি হয় সাহিত্যিকের জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই।[১] তাই অমিয়ভূষণ তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যেও যে জীবনকে অন্বেষণ করেছেন তা তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে মেনে নিতে বাধা নেই। আবার তাঁর এই অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে সমাজ নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই; যে কারণে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমকালের ও সমাজের ছাপ পড়ে অবধারিত ভাবেই, তবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ নয়, প্রেক্ষাপট তৈরি করে মাত্র। নকশালবাদীদের মতবাদকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে না পারলেও এঁদের প্রতি তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি 'উত্তরাধিকার' (১৯৯৫) পত্রিকার সাক্ষাৎকারে জানান–

> "নকশালদের সম্বন্ধে আমার অনুভূতি তো আমার গল্প-উপন্যাসগুলিতে বহু কোন থেকে বলা হয়েছে। ... আমি গোড়া থেকেই জানতুম ওটা অ্যাডভেঞ্চারাইস্ট স্টেনিলিসম, stalin-এর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল, অদের কাছে ছিল শুধু রক্তপিপাসা। রক্তপিপাসাটা মানুষের primitive স্টেজ থেকেই আছে। একসময়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 117
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> নরবলি হত, কাপালিক ছিল, ক্যানিবলিজম ছিল। তা তাদের চোখে খারাপ উদ্দেশ্যে করা হত না। সমর্থকদের যুক্তি ছিল।”[২]

–এই কারণে হয়তো তিনি নকশালবাদী আন্দোলনকারীদের যুক্তিকেও অস্বীকার করতে পারেননি। বরং তাঁদের প্রতি তিনি অন্যধরনের সহানুভূতিশীল এবং বলা যায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করতেন। ‘লিটিল ম্যাগাজিন ও আমি’ প্রবন্ধ থেকে –

> “ব্যর্থ নকশাল যুবকরাও এ জন্য ভালো যে; তারা অন্তত ড্রাগ অ্যাডিক্ট নয় এবং ধেনো আসক্ত নয়, যুবতীদের সর্বনাশ করে গর্ব করে না।”[৩]

তাই মতবাদের দিক থেকে নকশালদের তিনি সমর্থন না করলেও এই যুবকদের মানসিকতা, এঁদের জীবনচর্যাকেই তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কথা মত – “কিন্তু মানুষ তো, এরা তো লাইফ!”[৪] এই ‘লাইফ’ অর্থাৎ জীবনগুলিকেই খণ্ড খণ্ড ভাবে তিনি তাঁর কয়েকটি গল্পে রূপ দিয়েছেন।

একটি পরিবারের আখ্যান তুলে ধরে অমিয়ভূষণ মজুমদার সমগ্র বাংলার ভয়ঙ্কর নির্মম পরিণতির চিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন ‘পায়রার খোপ’ গল্পে। গল্পের অন্যতম চরিত্র গগন আচার্য, একজন স্কুল টিচার, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এগারো বছর জেল খেটেছিলেন; তাঁর দেখা ভয়ানক একটি স্বপ্ন হল ‘পায়রার খোপে ভাম’ – যেন তাঁর পরিবারের ক্ষেত্রে সত্যি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, চাকরির সন্ধানে নাজেহাল, অন্যদিকে পরিবারের জাঁতাকলের চাপে পরে রেলের তার চুরি করতে গিয়ে মৃত্যু হয়। মেজোছেলে পুলিশের চাকরি নিয়ে হয়ে ওঠে শ্রেণিশত্রুদের স্পষ্টতম প্রতীক। আর ছোটো ছেলে ও তার বন্ধুরা কোনো এক অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়েছে – যা সকলেই জানে অথচ প্রত্যেকের অজান্তে কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার পথে কোনো সংগঠনে যুক্ত হয়েছে। এই সংগঠনের ছেলেদের হাতেই তাঁর মেজোছেলে মারা যায়; তাঁর ছোটো ছেলে সমস্তটা জানতো তারপরও তার দাদাকে সে সাবধান করতে পারেনি। এই সংগঠনেরই অন্যতম সদস্য ছোটো ছেলের বন্ধু শুধুমাত্র ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার বন্ধুদের হাতেই মৃত্যুবরণ করে। আবার একই সঙ্গে এও দেখা যায় যে ওই বন্ধুদের অনেকেই লাবারিশ লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার পাশে। অন্যদিকে ছোটো ছেলে পরিবারের হয়ে তার মেজোবৌদিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে abortion করাতে, কারন তার দাদা চার মাস আগে মারা গিয়েছে অথচ বৌদি হচ্ছেন চার মাসেরই গর্ভবতী – সমাজের নিষ্ঠুর প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতে তাদের এই পদক্ষেপ। এভাবে সমাজের এক অন্তঃসারশূণ্য অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। এইভাবে গগন আচার্য-এর ভয়ানক স্বপ্ন অনিবার্য ভাবে রূপ পাচ্ছে তাঁর পরিবারের উপর। শুধু কি কোনো একটি পরিবার, সমগ্র বাংলা যেন তখন পায়রার খোপে পরিণত হয়েছে, আর সেখানে কোনো ‘ভাম’ ঢুকে গিয়ে প্রত্যেকটি জীবনকে একে একে নষ্ট করছে – যার নিষ্ঠুরতায় বাদ পড়ছে না বর্তমান-ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এমনকি গর্ভের সন্তানও।

মানুষের রক্ত পিপাসার আদিম প্রবৃত্তি কীভাবে আজও বর্তমান সেই চিত্রগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে রূপ পেয়েছে ‘তন্ত্রসিদ্ধি’ গল্পে। প্রথমেই দেখি একজন সাধক তাঁর সিদ্ধি সাধনের জন্য অতি সহজেই নরবলি দিয়ে দেন। তারপর কয়েক পুরুষের জীবনক্রম তুলে ধরে বেশকিছু মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়েছেন গল্পকার এবং শেষে গিয়ে এক নকশালপন্থী আন্দোলনকারীর নির্মম মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরেছেন। পলাশরা এখন বড় হয়েছে, পলাশ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে সুদেষ্ণার কাছে, তাদের দুজনের নানা আলোচনার মধ্যে উঠে আসে সুদেষ্ণার দাদা সুরথের মৃত্যুর কথা। পলাশ জানতে পারে এই সুরথের আজ জন্মতিথি। পলাশ যখন হায়ার সেকেণ্ডারিতে পড়ে তখন তার বাবা টাকা ধার করতে এসেছিল সুরথের কাছে কিন্তু তার বাবাকে সুরথ তাড়িয়ে দিয়েছিলো। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সুরথের গলা কেটে মৃত্যু হয় তার শত্রুর হাতে। এই ঘটনার বহুবছর পেরিয়ে গিয়েছে আজ কিন্তু তারপরও সুরথের জন্মতিথিতে একমাত্র পলাশই কেনো নিমন্ত্রিত – এ প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে থাকে। পলাশ স্বীকারও করে সুদেষ্ণার কাছে একসময় তারা যে নর হত্যাগুলো করেছিল, সেগুলো তাদের ভুল পরিকল্পনার ফল। তারা ওই পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল। যাইহোক মৃত্যু ও রক্ত এ নিয়ে পলাশ ও সুদেষ্ণার মধ্যে আলোচনা চলতেই থাকে। একসময় পলাশ কোনো কারনে বাইরে গেলে সুকুমারের কুকুর তাকে তাড়তে থাকে এবং তাড়তে তাড়তে বনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে। সুদেষ্ণা তা বুঝতে পারলে দরজা ভিতর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 117
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থেকে আটকে দেয়। এই ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা তো নরহত্যার হিংস্র চেতনা থেকেই জন্ম নেয়। এই গল্পে যেমন কিছু নকশাল আন্দোলনকারীর ভয়াবহ পরিণতি ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার, তেমনি মানুষের অন্তসত্তার মধ্যে কীভাবে লুকিয়ে রয়েছে রক্তপীপাসার ভয়াবহ চাহিদা – তা গল্পকার কলমের আচড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে স্তরে স্তরে পরিবেশন করেছেন এই গল্পে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষের হিংস্র চেতনাগুলি জেগে ওঠে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য, যার ফলে কিছু ভয়ানক অনিবার্য মৃত্যু ঘটে যায়।

অন্যতম গল্প হল 'মামকাঃ', উক্ত শব্দটির অর্থ হল 'মানসে' – অর্থাৎ মানুষের অন্তর স্থিত বিশেষ চেতনায় বা মননে তার অনুভূতি। গল্পে দেখা যায় এক আন্দোলনকারীর অসুস্থ অবস্থায় তার মানসিক বৈকল্যকর পরিণতির চিত্র। তার বাস্তবজীবনে ছিল দ্বৈত-সত্তা, কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার নিজের মধ্যেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে - আদতে কোনটা তার গোপন সত্তা! সমাজ কল্যানের তাগিদে মানুষটি নিজেকে লেদুমিঞা রূপে গোপন করেছিল কিন্তু ঠিক এই সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে নিজের বাস্তব সত্তাই ফিরতেই পারছিল না; সে বুঝতেই পারছিল না যে সে আদতে লেদুমিঞা না কি সুপর্ণ কাঞ্জিলাল। তার এই দুই রূপের চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটাই জোড়ালো হয়ে উঠেছিল যে সে কখনো নিজেকে লেদুমিঞা ভেবে কথা বলছিল আবার কখনো সুপর্ণ কাঞ্জিলাল ভেবে। তার অসুস্থ অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছে তারই দুই বন্ধু কিন্তু কোনোভাবেই তাকে অপারেশনের জন্য তার বন্ধুরা হসপিটাল নিয়ে যেতে পারছিল না, কারন সুস্থ হওয়ার পরই পুলিশ তার জীবন ছিনিয়ে নেবে। আর অন্যদিকে যদি বাড়িতে তার চিকিৎসা করা হয় তাহলেও সে সুস্থ হতে পারবে না, অবধারিত তার মৃত্যু ঘটবে। সমাজ মুক্তির আশায় যে মানুষটি আন্দোলনে পা বাড়িয়েছিল, আজ অসুস্থ অবস্থায় তারই মুক্তির কোনো উপায় নেই। যেমন করেই হোক সমাজ তাদের জীবন ছিনিয়ে নেবেই, এমনকি শান্তিতেও তাদের মরতে দেবে না। আন্দোলনই তাদের জীবনধর্ম, আর ঠিক সে কারনেই মৃত্যুই তাদের পরিণতি।

নকশালবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অমিয়ভূষণের অপর গল্পটি হল 'মৃন্ময়ী অপেরা'; মানুষের জীবনকে যাত্রাপালার সঙ্গে তুলনা করার অভিলাষেই হয়তো তাঁর এই নাম গ্রহণ। জীবনে প্রতিনিয়তই নানা রকমের রদবদল ঘটে, সময়ের বিভিন্ন বাঁকে বিভিন্ন অঘটনের সম্মুখীন হয় জীবন, আবার অতীতের খারাপ ঘটনা অনেক সময়ই জীবন ভুলেও থাকতে চাই, তার থেকেও বড় কথা সেই সময়ের নাম অনির্ধারিত অনিশ্চয়তায় কখনো সেই অতীত হঠাৎ করেই উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন সামগ্রিক ভাবে বদলে যায় বর্তমান সময়, সমগ্র জীবন চর্যা। অপেরার মালিকের রহস্যজনক মৃত্যু হওয়ায় পুলিশি তদন্তে বলা হয় বিপ্লবীদের হাতে মৃত্যু হয়েছে তার। শাসনযন্ত্র তথা শাসক দল জানিয়ে দিয়েছে কোনো নতুন মানুষ দেখতে পেলে পুলিশকে জানাতে। পরমুহূর্তে অপেরার অন্যান্য বড় অভিনেতারা নিজেদের অন্যান্য কাজকর্ম শুরু করে দেয়, ছিধরও এখানে এসে নিজের নতুন এক জীবন পাই। নিজের অতীতকে সে গোপন করতে চাওয়ার জন্যই অন্যের অতীত সম্পর্কে সে কখনো প্রশ্ন করত না। দারোগা যখন জানতে পারে ছিধর নতুন এক মানুষ, তার সম্পর্কে সেভাবে কেউ কিছু জানে না, তখন তিনিও কোনো কিছু জানতে না চেয়ে সোজাসুজি গুলি করে মৃত্যুর হাতে অর্পন করে তাকে। শাসনযন্ত্রের গোপন গণহত্যার রূপ দেখি এখানে। যদিও গল্পকার কোনোভাবেই একথা জানাননি যে ছিধর আসলে কে ছিল এবং কেনই বা তার মৃত্যু হল। শুধু গল্পের পরিণতি দেখে আমাদের অনুভব হয় যে কত মানুষের সঙ্গেই তো আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়, কত জনেরই বা অতীতের আমরা খবর রাখি, আর কত জনই বা নিজের অতীত বলতে চাই; কিন্তু কতজনেরই বা অতীতের খাতিরে এমন মৃত্যু হয়! তবে একথাও সত্য হয়ে ওঠে যে অতীত গোপনের ক্ষতি মৃত্যু হতেও পারে – যখন সমাজ নকশাল আন্দোলনের মত কোনো আপত্তিজনক সময়ে অবস্থান করে তখন এমন পরিণতি খুবই অনিবার্য।

নকশাল আন্দোলনের প্রভাব পরিবারের তরুণীদের উপরও অনিবার্য রূপে এসে পড়েছিল, তারই জ্বলন্ত ক্ষতিয়ান হল 'অন্ধকার' গল্পটি। জীবনের আশায় দুই তরুণী জীবন সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু নিজেদেরকে জীবনের মধ্যেই হারিয়ে ফেললো তারা – সেই অন্ধকার জীবনের আখ্যান হল এই গল্পটি। আসলে গল্পটিতে স্থান পেয়েছে সেই সত্তরের দশকের মধ্যবিত্ত জীবনের অন্ধকারের প্রতি হাতছানির আখ্যান। দুই বোন বিজয়া ও জয়া তাদের বাবা মধ্যবিত্ত জীবনের জাঁতার তলায় পড়ে এখন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে বসে পড়েছে। তাদের কলেজের টিউশন ফি চলছে মায়ের হাতের চুরি বিক্রি করে। বড় বোন বিজয়ার চোখে দেখতে অসুবিধে হয়, কম খাওয়ার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই জীবনকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 117
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অতিক্রম করবার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে জয়া জীবনের প্রত্যেকটি স্বাদ পেতে চাই; সে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে জীবনকে। তাই সে নিজে না পেলেও তার ফুলদুটিকে সূর্যের শেষ আলোটুকু পর্যন্ত দিতে চাই। কিন্তু সে বাস্তবের সম্মুখীন হলে তার জীবন অন্য মাত্রা পায় – তার এক সহপাঠী গোপনে তাকে একটি খাপে ভরে বন্দুক দিলে এবং পরের দিনই ওই বন্ধুটির মৃত্যু ঘটলে – সে এই জীবন রহস্য বুঝে উঠতে পারে না। সে এটাও বুঝতে অসমর্থ হয় যে তার দিদি কী চাকরি করছে? তার জন্মদিনে দিদি যখন একটি দামি ঘড়ি ও হীরের হার উপহার দেয় এবং ব্যাগের মধ্যে যখন অনেক টাকা দেখতে পায়, তখন সে অনুভব করে তার দিদি হয়তো তাদের পরিবারকে বাঁচাতে কোনো অন্ধকার পাঁকের মধ্যে পা বাড়িয়েছে। তাই সে দিদিকে বাঁচাতে বিজয়া যার কাছে কাজ করে তাকে মেরে ফেলে ঐ বন্দুকটি দিয়ে। তখন জয়ার পরিণতি হয় দ্বীপান্তর, কারণ এই রাজনৈতিক দোলাচলতার সময় এরকম মার্ডার অনেক হচ্ছে এবং এগুলিকে নির্মম হাতে দণ্ড দেওয়া সরকারের কর্তব্য। জীবনে আলোর আশা করতে গিয়ে তারা অন্ধকারেই নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছে। অন্ধকার এই সময়কালের মধ্যবিত্ত জীবনকে বিশেষ করে জয়া-বিজয়ার জীবনকে জড়িয়ে আছে যে তারা চাইলেও আলোতে আসতে পারে না, শুধুমাত্র আলোর হাতছানি পাই, অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করে এই সমাজ প্রেক্ষাপট।

অমিয়ভূষণের আরো কয়েকটি নকশালবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা গল্প হল ‘রাং তার আলো’, ‘নেই কেন সেই পাখি’, ‘বেতাগ, ‘বাইতোড়’, ‘সরসুনা’ প্রভৃতি – এই গল্পগুলিতেও অমিয়ভূষণের নির্বাচিত জীবন শিল্পরূপ পেয়েছে যা নকশালবাদী আন্দোলনের দ্বারা কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত। তবে প্রত্যেক গল্পের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পের পরিণতি টেনেছেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা মানব চরিত্রের চিরকালিক কোনো বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়ে। যার ফলে কোনো গল্প কোনো বিশেষ ঘটনাক্রমের জালে রুদ্ধ না থেকে সর্বকালীন মাত্রা পেয়েছে। তাই গল্পগুলি অমিয়ভূষণের জীবনাভিজ্ঞতার দ্বারা রপ্ত হয়ে নকশাল আন্দোলনের প্রভাবজাত ঠিকই কিন্তু মানব জীবন চরিত্রের অমোঘ রসায়নে সিক্ত এবং ‘সহৃদয়বান’ এর হৃদয়সঞ্জাত।

Reference:

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘সাহিত্যিক জীবন মহাশয়’, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’, সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৮৭
২. সাক্ষাৎকার : সৌরভ, অনিন্দ্য, ‘মরণকে শ্যামসমান মনে করতে গেলে হাসি পায়...’, ‘উত্তরাধিকার’, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩৬
৩. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘লিটল ম্যাগাজিন ও আমি’, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র', ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জুন ২০০৮, পৃ. ২০
৪. সাক্ষাৎকার : দেবব্রত চক্রবর্তী, ‘নবার্ক’, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. সা ১০